ভূমিকা

আজকের বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছর। এই হাজার বছরে বাংলা সাহিত্যের ভাষা, ভঙ্গি ভাব ও বিষয়ের বৈচিত্র্য ইত্যাদির লক্ষণ দেখে পণ্ডিত গবেষকরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করেছেন -- ক. ৯০০ - ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ তুর্কী আক্রমণের পূর্বসময়, খ. ১২০০ - ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ এয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ, গ. ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রাচীন যুগে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি প্রায় দু'শ বছরের বেশি হলেও সেই সময় পর্বে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল কিছু পদসংকলন, যেগুলি চর্যাগীতিকোষ নামে পরিচিত। এই পদসংকলনের রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতক। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য দশম শতাব্দীরও পূর্বে বাঙালির অ-বাংলা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত-অবহটঠ ভাষায় সাহিত্যচর্চা।

তুর্কী আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান শাসন কাল মধ্যযুগ নামে অভিহিত। তুর্কী আক্রমণের পরে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য লৌকিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। চর্যাপদের পর সুদীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। রচিত হলো সাহিত্যের নিত্য নতুন ধারা। বিষয় বৈচিত্র্যে মধ্যযুগের সাহিত্যের ব্যাপ্তি কম নয়। অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, নাথসাহিত্য, অন্নদামঙ্গল, শাক্ত পদাবলীর মত সাহিত্য ধারায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল সমৃদ্ধ।

মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই ধরণের গবেষণা কতখানি প্রাসঙ্গিক। আমাদের অনেকেরই মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আর এখন তেমন বলার কিছু নেই। কিন্তু মধ্যযুগের একজন পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা ঠিক নয়। আসলে মধ্যযুগ সম্বন্ধে এরূপ ভাবনার কারণ হল -- মধ্যযুগের সাহিত্যকে আমরা মূল্যায়ন

করতে চেয়েছি একালের বিচারের মানদণ্ডে। কিন্তু আমরা ভুলে যায সাহিত্য সংস্কৃতি প্রবহমান। মধ্যযুগের আবহ যে বাঙালী সভ্যতার, সংস্কৃতির বিশেষ পর্যায় তা থেকে আমরা আত্মবিস্মৃত হই। ফলে মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও প্রাসঙ্গিক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একটি প্রধান ধারা হল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। বাংলাদেশে ষোড়শ শতকে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথাকে আশ্রয় করে যে দেবী ভাবনা মূলক প্রথা নির্দিষ্ট এক কাব্যধারার উদ্ভব ঘটে তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নামে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মঙ্গলকাব্যের এই বিশেষ শাখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দ্বন্দ্বময় জীবন সংঘাতের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বন্দ্ব কখনো আর্য অনার্য ধর্মসংস্কৃতির, কখনো বা শিবশক্তির; আবার কখনো ব্রাহ্মণ্যের কিংবা উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের। কখনো বা পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর অথবা পৌরাণিক লৌকিক ধর্ম সংস্কৃতির। চর্যাপদে যে শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র লক্ষ্য করা যায় সেই একই ছবি আবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেখা যায়। আমার গবেষণা কর্মটিতে মূল অন্বেষণের বিষয়টি হল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ এবং স্বতন্ত্র অনুসন্ধান। মঙ্গলকাব্য তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়েছে পৌরাণিক, লৌকিক এবং তান্ত্রিক বিষয়কে অবলম্বন করে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের কবি মানিক দত্ত, পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজমাধব এবং পশ্চিমবঙ্গের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী -- এই উপাদানগুলির উপর নির্ভর করেই সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণ করেছেন। আমরা দেখেছি প্রাক্ ঐতিহাসিক কাল থেকেই মহাশক্তির বন্দনা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের মধ্য দিয়ে প্রচলিত হয়ে এসেছে। মহাশক্তির যে বিচিত্র রূপ পুরাণে বা তন্ত্রে পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে তা বলা সহজসাধ্য নয়। ঋগ্বেদে ঊষা, অদিতিও সরস্বতী স্ত্রীদেবতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। দেবমাতা অদিতি, সূর্যপত্নী ঊষা, জ্যোতীরূপা সরস্বতী এবং পরে শ্রীলক্ষ্মী একীভূত হয়ে দানব দলনী জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রুদ্র শিবজায়া শিবানী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। আবার চণ্ডী চরিত্রের মধ্যেও আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। দেবী চণ্ডী চরিত্রের স্বরূপ ঋগ্বেদ থেকে ধীরে ধীরে যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের পথ ধরে পৌরাণিক যুগে পরিণতি লাভ করেছে। দেবী চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমবায়ে দেবীর বিবর্তনও ঘটেছে।

বেদ, পুরান, তন্ত্র প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্যের ধারা অনুসরণ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ উত্তরবঙ্গের কবি মানিক দত্ত, পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজমাধব ও পশ্চিমবঙ্গের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাদের কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁরা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে দেবী চণ্ডীর স্বরূপের সেই ভিন্নতা নিম্নলিখিত অধ্যায়ের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি --

প্রথম অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রাক্ পর্বে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ।
দ্বিতীয় অধ্যায় : তিন বঙ্গের তিন কবির নাম পরিচয়।
তৃতীয় অধ্যায় : তিন বঙ্গের তিন কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়।
চতুর্থ অধ্যায় : মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ।
পঞ্চম অধ্যায় : দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ।
ষষ্ঠ অধ্যায় : মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অন্বেষণ।
সপ্তম অধ্যায় : তিন কবির সৃষ্ট দেবী চণ্ডীর স্বরূপের ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য।

প্রথম অধ্যায়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং ঐতিহাসিক কালে দেবী চণ্ডীর স্বরূপের বিবর্তন তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন বঙ্গের তিন কবিদের বাসস্থান এবং তা নিয়ে যে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে তিন কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অধ্যায় বিভাজন এবং কাহিনী সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবি মানিক দত্ত, কবি দ্বিজমাধব এবং কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপের বিশ্লেষণ করেছি। সপ্তম অধ্যায়ে তিন কবির দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে এবং কবিগণ দেবীর স্বরূপ বিবর্তনের যে স্বতন্ত্রতা দেখিয়েছেন সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। আমার গবেষণা প্রকল্পে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ্য রেখে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। আমার গবেষণা কর্মের মাধ্যমে দেবী চণ্ডীর পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ নির্মাণের চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিন কবি তাঁদের কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন তাও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণা কর্মের অগ্রগতিতে প্রধানত তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।